শান্তি পথ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব

যদি আপনাদের কাউকে খবর দেয়া হয় যে, অমুক বাজারের অমুক স্থানে এমন একটি দোকান আছে যার মালিক, রক্ষক, ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং টাকা-পয়সা উসুলকারী কেউ নেই, অথচ উক্ত দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও টাকা-পয়সা আদান-প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কাজ আপনা আপনিই যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছে তখন আপনাদের কেউ এ অদ্‌ভূত ধরনের কথাটি বিশ্বাস করতে পারেন কি? অথবা কেউ যদি বলে যে, এ শহরে এমন একটি কারখানা আছে, যার মালিক বলতে কেউ নাই, ইঞ্জিনিয়ার বা মিস্ত্রিও তথায় দরকার হয় না, বরং কারখানাটি উক্ত স্থানে নিজে নিজেই বিদ্যমান ; প্রত্যেকটি মেশিনও নিজ হতেই গঠিত, মেশিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো আবশ্যক অনুযায়ী স্ব-স্ব স্থানে নিজে নিজেই লেগে যায় ; তারপর মেশিনও আপনা হতেই চলতে থাকে এবং তা হতে বহু আশ্চর্য ধরনের নুতন নুতন জিনিসও বের হতে থাকে তখন আপনারা এ খবরটিকে সত্যরূপে গ্রহণ করতে পারবেন কি? আমি জানি, নিশ্চয়ই আপনারা এ ধরনের সংবাদকে এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিবেন এবং সংবাদবাহককে পাগল বলে বিদ্রূপ করবেন। অনুরূপভাবে আমাদের চোখের সামনে প্রজ্জ্বলিত বিজলী বাতিগুলো সম্বন্ধে যদি কেউ বলে যে, এই বৈদ্যুতিক লাইটগুলো যথাসময়ে আপন হতে জ্বলে উঠে ও নিভে যায়, তখন আপনারা একথাটি সত্য বলে মনে করতে পারেন কি? তদ্রুপ যে বস্ত্র আমরা পরিধান করি, যে চেয়ারে আমরা বসি এবং যে ঘরে আমরা বসবাস করি ; উক্ত বস্ত্র, চেয়ার ও থাকার ঘর আপনা হতে তৈরি হওয়ার সংবাদ কোনো নামজাদা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মুখে শ্রবণ করলেও আপনারা তা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।

উল্লেখিত ঘটনাবলী দ্বারা এমন কতগুলো জিনিসের উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করা হলো, যা আপনারা দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়েই দেখে আসছেন। যদি একটি মামুলি দোকান-কারখানার অস্তিত্ব মালিক ও নির্মাণকারীর প্রচেষ্টা ছাড়া গড়ে উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়, তবে আকাশ ও পৃথিবীর এই বিরাট কারখানা যেখানে চন্দ্র-সূর্য ও অগণিত তারকারাজি বিদ্যমান এবং যেখানে সমুদ্রের বাষ্প উপরে উঠে ঠাণ্ডা হাওয়ার সাহায্যে মেঘমালায় পরিণত হয় এবং পরে তা বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে শুষ্ক ও মৃত জমিকে সরস সজীব করে তোলে, তারপর নানা রঙের নানা বর্ণের নুতন নুতন ফুলে ফলে এই দুনিয়াকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে মানব জাতির জীবন ধারণের মান বৃদ্ধি করে, তার প্রকাণ্ড ও বিষ্ময়কর অস্তিত্ব আপনা হতে গড়ে উঠা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? তাই আপনাদের একথা স্বীকার করতে হবে যে, এ বিরাট কারখানাটির অস্তিত্বের পিছনে কোনো এক কুদরতী হাতের কার্যকরী ইঙ্গিত অবশ্যই লুকিয়ে রয়েছে।

মানব দেহ গঠনের উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকগণ দেখতে পেয়েছেন যে, শরীরে কিছু পরিমাণ লৌহ, গন্ধক, কয়লা, ক্যালসিয়াম লবণ ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। উল্লেখিত জিনিসগুলোর প্রত্যেকটি যথাপরিমাণে গ্রহণ করে যদি কোনো ব্যক্তি মানুষ সৃষ্টির চেষ্টায় যত্নবান হয়, তবে সে উক্ত কাজে কখনো কৃতকার্য হতে পারবে কি? আপনারা নিশ্চয়ই স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিবেন কিছুতেই নয়। যদি তা আপনাদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়, তবে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চলনশক্তি এবং রকমারি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শক্তিসম্পন্ন, সুন্দর, সুগঠিত মানুষ সৃষ্টির পিছনে কোনো এক শক্তিশালী মহাজ্ঞানী সুনিপুণ ও সুবিজ্ঞ হাকিমের হেকমতি ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের জন্য যুক্তি ও বিজ্ঞানের দিক দিয়েও খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

মাতৃগর্ভস্থ ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরীতে সন্তান জন্ম হওয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আপনারা কখনও চিন্তা করে দেখেছেন কি? সন্তান জন্মানোর পিছনে মাতা-পিতার তদবিরের কোনো প্রভাব বাস্তবিক পক্ষেই নেই। রেহেম বা মাতৃগর্ভস্থ ছোট থলিটিতে কিভাবে, কার কুদরতী হাতের ইশারায় স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পর দুটি অতীব ক্ষুদ্র কীট যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখা কষ্টসাধ্য মাতৃগর্ভে পরস্পরে মিলিত হয় এবং অলৌকিকভাবে মাতার রক্ত তার খাদ্যরূপে নির্ধারিত করা হয়, তারপর ,উল্লেখিত লোহা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি নির্জীব পদার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণে তথায় একত্রিত হয়ে ধীরে ধীরে একটি গোশতের টুকরার সৃষ্টি হয় এবং অভিনবরূপে তা বাড়তে থাকে। অতপর উক্ত টুকরার যথাস্থানে হাত, কান, নাক, জিহ্বা, মস্তক ও মস্তিস্ক এবং শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ স্থাপন করা হয়। পরে ঐ নবগঠিত দেহে প্রাণের সঞ্চার করা হয় এবং মাতৃগর্ভস্থ শিশু আশ্চর্যরূপে মাতৃরক্তে লালিত হতে থাকে। তারপর উক্ত শিশুর কানে শ্রবণশক্তি, চোখে দৃষ্টিশক্তি, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণের শক্তি ও অন্তরে অনুভব করার শক্তি এবং অন্যান্য যাবতীয় শক্তি প্রদান করে কোমল দেহটিকে সর্বাংগীন সুন্দরভাবে

গঠন করে তোলা হয়। উপরোক্ত কার্যাবলী সমাধানের যে পরিমাণ সময় আবশ্যক, তা অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ একদিন মাতৃগর্ভস্থ সেই ছোট ফ্যাক্টরী উক্ত সন্তানকে প্রসব বেদনার সাহায্যে বাইরে নিক্ষেপ করে। এমনিভাবে অগণিত সন্তান উক্ত ফ্যাক্টরীর ক্ষুদ্র স্থান হতে এ বিরাট ও প্রশস্ত দুনিয়ায় আগমন করছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল মানব সন্তানের দৈহিক গঠনে, মনের চিন্তাধারায়, অভ্যাসে ও যোগ্যতা প্রদর্শনে এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে একের সাথে অন্যের বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, এমনকি মাতৃগর্ভস্থ দুই সহোদরের মধ্যেও কার্যক্ষেত্র, স্বভাব-প্রকৃতি এবং অন্যান্য দিক দিয়ে বহু পরিমাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মানব সন্তান সৃষ্টির উল্লেখিত তথ্যপূর্ণ লিলাসমূহ অবলোকন করার পরেও যদি কোনো ব্যক্তি বলতে সাহস পায় যে, এর পশ্চাতে কোনো শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী, সুনিপুণ কারিগরের কারিগরি বিদ্যমান নেই, তবে আমরা উক্ত ব্যক্তিকে নির্বোধ এবং তত্ত্বপূর্ণ আলোচনার সারমর্ম গ্রহণে অক্ষম বলতে বাধ্য হবো।

একত্ববাদ

আমাদের বিবেক নিঃসন্দেহে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এ দুনিয়ায় ছোট-বড় যে কোনো কাজ সম্পাদনের দায়িত্বভার দুজনের হাতে অর্পণ করে আদৌ কোনো সুফল পাওয়া যায় না ; তাই একই মাদ্রাসা বা স্কুলে দু' প্রধান শিক্ষক, একদল সৈন্যের দু'জন সেনাপতি এবং একই রাজত্বে দু' রাজার কর্তৃত্ব পরিচালনার সংবাদ আমাদের গোচরীভূত হয় না এবং স্বভাবত তাহা হতেও পারে না। আমাদের জীবন পথের ছোট-খাট ব্যাপারের মধ্য দিয়েও আমরা এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হই যে, সুশৃংখলার সাথে কোনো একটি কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে তার দায়িত্বভার একজনের হাতেই অর্পণ করা আবশ্যক।

উল্লেখিত সরল ও সোজা কথাটিকে স্মৃতিপটে জাগরূক রেখে একবার বিস্তৃত সৃষ্টিলোক, এ জমি যাতে আমরা বসবাস করি, এ চন্দ্র যা রাতের বেলা আমাদের দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, এ সূর্য যা প্রতিদিন উদয় হয় ও অস্ত যায়, এ অগণিত তারকারাজি যা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আকাশে পরিদৃশ্যমান হয়, এই সমস্তের ঘূর্ণনের মধ্যে একটি সুশৃংখলিত নীতি বিদ্যমান রয়েছে। তাই রাত বা দিনের আগমন কখনো আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দৃষ্ট হয় না। চাঁদ কখনো পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায় না। সূর্য কখনো আপন গন্তব্য পথ ছেড়ে এক কদমও এদিক ওদিক যায় না। এ অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ তারকারাজি যার মধ্যকার কোনো কোনো তারকা আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণে বড় প্রত্যেকটি ঘড়ির যন্ত্রপাতির ন্যায় এক বিরাট শৃংখলায় আবদ্ধ এবং এক নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী আপন নির্দিষ্ট পথে গতিশীল। কেউ আপন পথ হতে এক চুল পরিমাণও টলতে সমর্থ নয়। এসবের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর সামান্য পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটলে এ পৃথিবীর সমস্ত কারখানায়ই উলট-পালট হতে বাধ্য এবং অসাবধানতা বা অনিয়মতার ফল স্বরূপ ট্রেনের সংঘর্ষের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ তারকারাজিতেও বিরাট সংঘর্ষের সৃষ্টি হতো।

এই তো গেলো আকাশ রাজ্যের কথা। এখন একবার এ পৃথিবী ও আমাদের আপন অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ ধূলির ধরায় আমাদের জীবন ধারণের সব বিচিত্র কর্মকাণ্ড ও কতকগুলি বিধি ব্যবস্থার সীমার মধ্যে আবদ্ধ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক জিনিসকে আপন সীমায় বেঁধে রেখেছে। উক্ত শক্তির অভাবে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টির সমস্ত কলকারখানা নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারখানার প্রত্যেকটি কল-কবজা বিশেষ শৃংখলার ভিতর দিয়েই আপন কর্তব্য সম্পাদন করছে। বাতাস আপন কর্তব্য কর্মে অবিরাম নিযুক্ত রয়েছে। পানিও তার নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করছে। আলোর করণীয় কাজও যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছে। এভাবে বছরের ঋতুগুলোও আপন আপন কতর্বø প্রতিপালনে রত। মাটি, পাথর, বিদ্যুৎ, বাষ্প, গাছ ও জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি কারো নিজ সীমার বাইরে চলার শক্তি নেই। এ কারখানার প্রত্যেক যন্ত্রই নিজের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে একে অন্যের সাথে মিলিতভাবে কাজ করছে এবং এ বিশ্বের সবকিছুর অস্তিত্বের পশ্চাতে উক্ত সম্মিলিত চেষ্টার ফল বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র বীজকে গ্রহণ করুন। তা আমরা জমিতে বপন করি। উক্ত বীজ কখনো একদিনে বিরাট গাছে পরিণত হয় না, বরং আকাশ ও পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তি এর পিছনে রয়েছে। ভূমি একে আদ্রতা ও উর্বরতার দিক দিয়ে সাহায্য প্রদান করছে। সূর্য এটাকে আলো-তাপ দিচ্ছে, পানি, বাতাস এবং রাত ও দিন একে সম্পূর্ণ জরুরি সাহায্য দান করছে। এ বিশেষ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বহুদিন, মাস, বছর ও কাল অতিবাহিত হওয়ার পর উল্লেখিত ক্ষুদ্র বীজটি এক বিরাট ফলন্ত গাছে পরিণত হয়। আমাদের জীবন ধারণের সহায়ক অগণিত ফসল ও ফল-মূল প্রাপ্তির পিছনে বহু শক্তির সম্মিলিত চেষ্টা নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদের বেঁচে থাকার পিছনেও আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির সম্মিলিত চেষ্টার ফল বিদ্যমান। কেবলমাত্র বাতাসও যদি উক্ত শক্তিসমূহ হতে বিলীন হয়, তবে আমরা মুহূর্তের মধ্যেই

ধ্বংস হয়ে যাবো ; যদি বাতাস ও উত্তাপের সাথে পানি সম্মিলিতভাবে কাজে যোগদান না করে, তবে আমরা এক ফোঁটা বৃষ্টিও লাভ করতে পারি না। মাটি ও পানির মিলিত চেষ্টা না হলে আমাদের বাগান শুকিয়ে যাবে, কৃষি কাজ বন্ধ হবে এবং থাকার ঘর নির্মিত হতে পারবে না। বারুদের ঘর্ষণ দ্বারা দিয়াশলাইয়ের কাঠি হতে আগুন সৃষ্টি না হলে আমাদের উনান জ্বলবে না এবং বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। লোহা ও আগুন সংমিশ্রণ ভিন্ন একখানা ছোট চাকু পর্যন্ত নির্মাণ করা অসম্ভব। মোটকথা এ বিরাট বিশ্ব শুধু এজন্যই টিকে আছে যে, এ সুবৃহৎ রাজত্বের প্রত্যেকটি বিভাগ বিশেষ শৃংখলার সাথে অন্য বিভাগের সাথে মিলিত হয়ে আপন কর্তৃব্য কাজ সম্পাদন করছে ; কোনো বিভাগের কোনো কর্মীর এমন কোনো শক্তি নেই, যার দ্বারা সে আপন কর্তব্য কাজে অলসতা প্রদর্শন করতে পারে বা সম্মিলিতভাবে কাজ সমাধার পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

আমার উল্লেখিত কথায় বিশ্ব-প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থার একটা বর্ণনা প্রদান করা হলো। অতিরঞ্জিত বিষয় বা মিথ্যার কোনো আশ্রয় এখানে গ্রহণ করা হয়নি। আশা করি এ সম্পর্কে আপনারা আমার সাথে একমত হবেন।

অতপর আমার জিজ্ঞাসা এই যে, এ বৃহৎ শৃংখলাও এ বিস্ময়কর উন্নত শক্তির মধ্যে এতো সুন্দর সামঞ্জস্যের যথার্থ কারণ কি থাকতে পারে? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে, হাজার হাজার যুগ ধরে যমীনের উপর উদ্‌ভেদ ও প্রাণীর উৎপত্তি হচ্ছে, তারপর পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে মানুষ জাতির অস্তিত্ব, তাও বহু যুগযুগান্তরের কথা। কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে চাঁদ কখনো আকাশের বক্ষ হতে ভূমিতে পতিত হয়নি, সূর্য ও পৃথিবীতে কখনো সংঘর্ষ বাঁধেনি, রাত দিন কখনো আপন সীমা অতিক্রম করে পরস্পর মিলিত হয়ে যায়নি। বাতাস ও পানিতে কখনো ঝগড়া বাঁধেনি। পানি ও মাটির পারস্পরিক সম্পর্কও নষ্ট হয়নি, উত্তাপ ও অগ্নির আত্মীয়তায়ও কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেনি। এখন গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক যে, এ রাজত্বের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্র এতোটা সুশৃংখলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কেন? কেন এখানে কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হয়নি? উত্তরে আপনার ভিতরকার মানুষটি নিঃসন্দেহে বলে উঠবে যে, উপরোক্ত সমস্ত কারখানার স্রষ্টা ও অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এ এক আল্লাহর আদেশই সকলের উপর কাজ করছে এবং এ বিরাট শক্তি সমস্ত কিছুকে এক শৃংখলায় বেঁধে রেখেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বহু খোদা তো দূরের কথা মাত্র দুই খোদা হলেও শৃংখলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃংখলা কখনো ঠিক থাকতো না থাকতে পারতো না। কারণ, সামান্য একটি মাদ্রাসা বা স্কুল পরিচালনার ভার দুই হেড মাওলানা বা দুই হেড মাষ্টারের হাতে অর্পণ করে যখন সুফল পাওয়া যায় না, তখন আকাশ ও পৃথিবীর এই বিশাল রাজত্ব কি করে দুই আল্লাহর কর্তৃত্বে পরিচালিত হতে পারে?

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রকৃত অবস্থা এই জানা যায় যে, এ বিরাট বিশ্বের অস্তিত্ব কখনো আপনা হতে গড়ে উঠেনি, বরং এর পেছনে রয়েছে এক স্রষ্টা যিনি এক ও অদ্বিতীয়, মহাশক্তিশালী সুবিচারক। তাঁর শাসন যমীন হতে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। সৃষ্টির প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর আদেশের অনুগত, মানব জাতির জীবন ধারণ ও তার উপাদানসমূহ একমাত্র তাঁর হাতেই নিবদ্ধ। বিশ্বের এ সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা পরিস্কাররূপে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, দুই শাসনকর্তার হুকুম ও শাসন এখানে কখনো চলতে পারে না। কারণ একাধিক শক্তির কর্তৃত্ব ও অধিকার অনিবার্যরূপে যেখানে সেখানে বিশৃংখলা ও ঝগড়ার সৃষ্টি করে থাকে। আবার শাসন পরিচালনার জন্য শুধু শক্তিই যথেষ্ট নয়, গভীর জ্ঞান ও প্রশস্ত দৃষ্টিরও বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে। এর দ্বারাই সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের যাবতীয় উন্নতির চিন্তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। যদি সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্রষ্টা হতো এবং এ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ও বিভিন্ন কাজে এদের স্বাধীনতা থাকতো, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর এ বিরাট কারখানা নিশ্চিতরূপে অচল হয়ে পড়তো। কারণ, আপনারা জানেন যে, একটি মামুলি মেশিন পরিচালনার ভার সুনিপুণ মিস্ত্রি বা ইঞ্জিনিয়ারের হাতে অর্পণ না করলে কখনো সুফল পাওয়া যায় না যেতে পারে না। তাই আমাদের বিবেক স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিশ্বরাজ্যের এ নিখুঁত ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার মালিক ও বাদশাহ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাজে কোনো অংশীদার নেই।

উল্লেখিত কথার দলিল স্বরূপ আরো বহু অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলার রাজত্বে তিনি ভিন্ন কারো কর্তৃত্ব চালানোর কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। কেননা যে সৃষ্টির অস্তিত্ব আল্লাহর কুদরতি ইঙ্গিতে গড়ে উঠেছে ও বজায় রয়েছে এবং যার সাহায্য ও দান ভিন্ন একটি মুহুর্তের জন্য সে চলতে অক্ষম, সে সৃষ্টির কোনো বস্তু বা ব্যক্তি কি আল্লাহর কর্তৃত্বে কোনোরূপ অংশীদার হতে পারে? আপনারা কখনো কোনো চাকরকে প্রভুত্ব খাটানোর ব্যাপারে আপন প্রভুর শরীক হতে দেখেছেন কি? ক্রীতদাস বা বেতনভোগী চাকরকে মালিক বা মনিব কখনো তাঁর সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অংশীদার করেন কি? উপরোক্ত কথার সারমর্ম উপলব্ধি করার পর একটু চিন্তা করলে আপনাদের বিবেক অনায়াসে এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহর এ রাজ্যে তাঁর বর্ণিত মত ও পথ ভিন্ন কেউ অন্য কোনো স্বাধীন মত পোষণ

ও প্রকাশ করার ন্যায়ত কোনো অধিকার রাখে না। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ বেপরোয়াভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে, তবে তা হবে প্রাকৃতিক নিয়ম, বাস্তবতার জ্ঞান ও সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ।

মানবজাতির ধ্বংসের মূল কারণ

উপরে বাস্তব সত্যের যে বর্ণনা দেয়া হলো, তার মধ্যেই সমগ্র জগতের নিগূঢ় রহস্য রয়েছে। অতপর অনুধাবন করার বিষয় এই যে, আমরা ও আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বসৃষ্টির বহির্ভূত কিছুই নয় বরং আমরা এ বিরাট সৃষ্টির সামান্য অংশ মাত্র। তাই আমাদের জীবন ধারণেও বর্ণিত নিয়মাবলীর প্রকাশ্য প্রভাব স্বভাবতই বিদ্যমান থাকতে বাধ্য।

আজ আমাদের প্রত্যেকের মনে একটি জটিল প্রশ্ন অতিশয় তীব্রভাবে বারবার জাগ্রত হচ্ছে। তা এই যে, শান্তি কোথায়? মানব জীবন আজ সকল প্রকার শান্তি হতে বঞ্চিত হলো কেন? কেন আজ জাতিতে জাতিতে বিবাদ, রাজায় রাজায় ঘোর মনোমালিন্য, সবলের উৎপীড়ন ও নির্যাতনে দুর্বল আজ দুর্দশাগ্রস্ত ও নাজেহাল। বন্ধুত্ব বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ, আর আমানতদারীর পরিবর্তে খেয়ানতের এতোটা প্রাবল্য কেন? কেন মানুষের প্রতি মানুষ আস্থাহীন, ধর্মের নামে ধর্ম-ধ্বংসের বিরাট কারসাজিই বা কেন? একই আদমের সন্তান হাজার গোত্রে বিভক্ত, এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের ভয়ানক বিবাদ-বিসম্বাদ, মানুষের ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত। এমনিভাবে অগণিত অপকর্মে কেন আজ আমাদের সুখময় জীবনের যাত্রাপথ সকল দিক দিয়ে বিপদ-সংকুল হয়ে উঠেছে। আরও চিন্তা করার বিষয় এই যে, সৃষ্টিলোকের অন্য কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো প্রকার অশান্তি নেই, তারকারাজ্যে শান্তি বিদ্যমান, হাওয়ায় শান্তি, জলে শান্তি, স্থলে শান্তি এক কথায় মানুষ ছাড়া প্রাকৃতিক জগতের যে কোনো স্থানে শান্তি বিরাজমান ; শুধু মানুষই শান্তির সুশীতল ছায়া হতে বঞ্চিত। তাই মানব মনে আজ এটা এক জটিল সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমাধানের জন্য সমগ্র মানবজাতি অস্থির হয়ে উঠছে। আমি কিন্তু অতীব ধীরস্থিরভাবে উল্লেখিত জটিল প্রশ্নের সংক্ষেপে এ উত্তরই প্রদান করবো যে, মানুষ আজ তার শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের স্বভাবসিদ্ধ রীতিসমূহের বিরুদ্ধে চলতে গিয়েই পদে পদে অগণিত বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে। আবার সে তার ভুল বুঝতে পেরে যখন আল্লাহর বিধানে বাধ্য হয়ে জীবনের যাত্রাপথ নির্ধারণে সচেষ্ট হবে, তখন তার হারানো শান্তি অবশ্যই ফিরে আসবে, অন্যথায় অশান্তি কখনো দূর হবে না, হতে পারে না। যেমন চলন্ত ট্রেনের দরজা ও তার পার্শ্ববর্তী রাস্তাকে যদি কেউ আপন ঘরের দরজা ও মেঝে মনে করে, তখন এ ভুল বুঝার জন্য ট্রেনের দরজা বা তৎপার্শ্ববর্তী রাস্তা কখনো তার থাকার ঘরের দরজা ও প্রাঙ্গণে পরিণত হবে না, পক্ষান্তরে, উল্লেখিত ভুল বুঝার শাস্তি স্বরূপ উক্ত অপচেষ্টাকারীর হয়তোবা পা ভাঙ্গবে, না হয় মাথা ফাটবে। এরপরও যদি উক্ত ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ভুল বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে ব্যাপারটা বড়ই দুঃখজনক ও লজ্জাকর হয়ে দাঁড়াবে।

এমনিভাবে যদি আপনাদের কেউ মনে করেন যে, এ বিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই বা মানুষই মানুষের স্রষ্টা, অথবা যদি কেউ আসল আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো নকল আল্লাহ মেনে বসে, তবে তার ভুল বুঝার দোষে আসল অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। বস্তুতপক্ষে এ বিশ্বের যথার্থ মালিক আল্লাহ তা'আলাই। তিনি চিরদিন আছেন ও থাকবেন এবং তাঁর বিশাল রাজত্বের সম্মুখে মানব সমাজ যে নগণ্য প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নয় সে কথাটিও পুর্বের মতই অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে উল্লেখিত বাস্তব ব্যাপারসমূহকে অন্যরূপ ধারণা করার শাস্তি স্বরূপ আমাদেরকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অগণিত বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমার উল্লেখিত কথাগুলোকে আবার নতুন করে অন্তরে স্থান দেয়ার নিবেদন জানিয়ে অতপর দ্বিতীয় কথা এই বলতে চাই যে, আল্লাহ তাআলা কারো মনগড়া খোদা নন, তাঁর কর্তৃত্ব আপনাদের মেনে নেয়ার প্রতি তিনি মুখাপেক্ষীও নন, বরং তাঁর কর্তৃত্ব তদীয় আপন শক্তিতে বিদ্যমান। তিনিই এ বিশ্বের স্রষ্টা, আসমান-যমীন এবং চন্দ্র-সূর্য তাঁরই হুকুমে পরিচালিত, সৃষ্টির সমস্ত শক্তিই তাঁর মুখাপেক্ষী। আমাদের জীবন ও জীবন ধারণের সমস্ত সামগ্রী তাঁর প্রদত্ত জিনিসসমূহের অন্যতম এবং আমাদের অস্তিত্ব তাঁর কুদরাতের নমুনা স্বরূপ। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ব্যাপার। আপনারা স্বীকার করুন আর না-ই করুন, এ প্রকৃত ব্যাপার কখনও অন্যরূপ ধারণ করতে পারে না। তবে প্রভেদ এই যে, আপনারা যদি এ স্বাভাবিক ও প্রকৃত সত্যকে জেনে নিয়ে এবং তা স্বীকার করে চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হোন, তখন সৃষ্টি পরিচালনার জন্য স্রষ্টা কর্তৃক বর্ণিত ও স্বভাবসিদ্ধ আইন-কানুন মেনে নেয়ার দরুন আপনাদের জীবন সুখে শান্তিতে আনন্দে সফলতার সুনিশ্চিতরূপে ধন্য ও সার্থক হয়ে

উঠবে। অন্যথায় চলন্ত ট্রেনের দরজাকে ঘরের দরজা মনে করে বাহরে পা রাখার দরুন কোনো নির্বোধ যাত্রীর অবস্থা যতোটা শোচনীয় হওয়া সম্ভব, আপনাদের অবস্থা ততোটা শোচনীয় ও লজ্জাষ্কর হতে বাধ্য।

এখন আপনারা হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, উল্লেখিত অবস্থানুযায়ী আমাদের বাস্তব স্বরূপ কি হতে পারে। তাই আমি সংক্ষেপে এর উত্তর প্রদান করছি। যদি আপনাদের কেউ বেতন ও খোরাকী দেয়ার শর্তে কোনো চাকর নিযুক্ত করেন তখন তার কর্তব্য কি হতে পারে? এটা নয় কি যে, সে আপনার হুকুম প্রতিপালন করবে, আপনার মর্জি অনুযায়ী প্রতিটি কাজ সম্পাদন করবে এবং এর মারফতেই চাকুরি ও আনুগত্যের প্রমাণ করবে। কেননা চাকরের কাজ চাকুরি ভিন্ন আর কি হতে পারে? আরও দেখুন, যদি আপনাদের কেহ সর্দার নেতা নিযুক্ত হন এবং তার অধীনে যদি কিছুসংখ্যক কর্মী থাকে, তবে সর্দারের আদেশানুযায়ী প্রত্যেক কাজ সমাধা করে তার প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দেয়া হবে তার কর্তব্য। অনুরূপভাবে আমাদের কেউ যদি কোনো সম্পত্তির মালিক হয়, তবে সে স্বভাবতই এটা চায় যে, উক্ত সম্পত্তির উপর যেনো তার ষোলআনা স্বার্থ ও ক্ষমতা বজায় থাকে, অথবা যদি কোনো রাজশক্তি আমাদের শাসক হয়, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে বাদশাহী কানুন ও আদেশ মেনে চলার পথ নির্ধারণ করাই হবে আমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় বিদ্রোহী সেজে রাজ-কোপানলে পতিত হয়ে নিজেই নিজের দুঃখের কারণ সাব্যস্ত হতে হবে।

উল্লেখিত উদাহরণ দ্বারা আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, আল্লাহর এ বিরাট রাজ্যে আপনাদের যথার্থ স্বরূপ কি হতে পারে। আল্লাহ-ই আপনাদের স্রষ্টা। কুদরাতের এমনি খেলা যে, আপনাদের কোনো কাজ তাঁর ইঙ্গিত ছাড়া সমাধা হয় না, আপনাদের লালন-পালন ও আহার্য বন্টন একমাত্র তাঁরই হাতে নিহিত। এক কথায় প্রত্যেক দিক দিয়ে তাঁর ও আপনাদের মধ্যে মনিব ও চাকরের সম্পর্ক বিদ্যমান। এ আকাশ ও পৃথিবী তাঁর সম্পত্তি এবং তাঁর সম্পত্তিতে তাঁরই হুকুম ও বিধানের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য চলবে। এখানে নিজেদের স্বাধীনতা চালাবার ন্যায়ত কোনো অধিকারই আপনাদের নেই। তাই বেপরোয়াভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চলার ইচ্ছা করলেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আপনারা এখানে প্রজা ভিন্ন আর কিছু নন। প্রজাদের মধ্যে কারো একথা বলার শক্তি নেই যে, আমি গভর্নর, আমি ডিরেক্টর, আমি স্বতন্ত্র ইত্যাদি এমনকি পার্লামেন্ট বা এসেম্বলী দ্বারা ইচ্ছাধীন আইন পাশ করে আল্লাহর বান্দাগণকে এ আইন মানানোর জন্য চাপ দেয়ার কোনো অধিকারও এখানে কারো নেই। আসল বাদশাহের প্রজা হওয়া ভিন্ন নকল ও মিথ্যা বাদশাহের প্রজা হওয়া ও তার বানানো নকল আইন মেনে চলা কখনও কোনো প্রজার জন্য সিদ্ধ বা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে বাদশাহীর দাবি করা বা অন্য নকল বাদশাহকে স্বীকার করা উভয়ই প্রকৃত বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য। আর এজন্য শাস্তিও সুনিশ্চিত। তাঁর কুদরাতের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার শক্তি কারো নেই। এমনকি মৃত্যুর পর আমাদের শরীরের প্রতিটি অংশ মাটিতে মিশে যাক বা আগুনে পুড়ে ভস্মে পরিণত হোক বা পানিতে মিশে মাছের খোরাক হোক বা অন্য কোনো প্রকারে বিনষ্ট হোক, যখন হিসাবের জন্য তিনি আমাদের তলব করবেন তখন হাওয়া, যমীন, পানি ও মাটি ইত্যাদি তাঁর হুকুমের অধীন হয়ে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হবে। ফলত আমাদের দীর্ঘদিনের ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরকেও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং রূহ ফুঁকে দিয়ে প্রশ্ন করা হবে হে আমার বান্দাহ ! আমার প্রজা হয়ে দুনিয়াতে বাদশাহীর ক্ষমতা তুমি কোথায় পেয়েছিলে? আমার রাজত্বে তোমার হুকুম চালাবার স্বাধীনতা তোমাকে কে দিয়েছিল? আমার বাদশাহীতে তোমার আইন জারি করার অধিকার কিভাবে তুমি পেয়েছিলে? আমার বান্দাহ হয়ে অন্য বান্দাদের নিকট বন্দেগী প্রাপ্তির জন্য কোন্ সাহসে তুমি যত্নবান হয়েছিলে? আমার দাস হয়ে কিরূপে তুমি আমার অন্য বান্দাকে দাস বানিয়ে রাখলে? আমার রাজত্বে থেকে কিরূপে তুমি অন্যের রাজত্ব ও অপরের মনগড়া আইন ও বিধান স্বীকার করলে এবং কিরূপে তুমি অন্যের রাজত্ব ও অপরের মনগড়া আইন ও বিধান স্বীকার করলে এবং কিরূপে উল্লেখিত বিদ্রোহমূলক কার্যসমূহ তুমি তোমার জন্য সংগত মনে করলে? এখন বলুন তো, আপনাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি সেদিনের এ সমস্ত জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম হবেন কি? কিংবা কোনো উকিল বা ব্যারিষ্টার আইনের মার-প্যাঁচ দ্বারা ঐ সময় আমাদের জন্য মুক্তি পথ নির্ধারণ করতে সক্ষম হতে পারবে কি? বা কোনো সুপারিশ আপনাদেরকে উল্লেখিত বিদ্রোহের অনিবার্য ফল হতে রক্ষা করতে পারবে কি? যদি মনে করেন যে, সেদিনের শাস্তি হতে অব্যাহতির যথার্থ পথ আজ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য ও হুকুমবরদারীর মধ্যেই নিহিত, তবে আর কালবিলম্ব না করে বিশ্বজাহানের যথার্থ মালিক ও প্রতিপালকের প্রত্যেকটি আইন ও হুকুম প্রতিপালনের ভিতর দিয়েই ইহকাল ও পরকালের সত্যিকার পথ অনুসন্ধান করুন।

অত্যাচারের কারণ

এখানে কেবল হক বা সত্যেরই প্রশ্ন নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তা এই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার এ অসীম কর্মময় রাজ্যে আইন প্রণয়ন ও রাজত্ব করার যথার্থ যোগ্যতা মানুষের আছে কি? আমি পূর্বে বলেছি যে, মেশিনারি কাজে অজ্ঞ ব্যক্তি মেশিন চালাতে আরম্ভ করলে তার অজ্ঞতা হেতু মেশিন নষ্ট হবেই, অজ্ঞ ব্যক্তিকে সামান্য মোটর গাড়ি চালাতে দিলে এর তিক্ত ফল আপনারা সহজেই অনুভব করতে পারবেন। এখন খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, যখন একটি লোহার মেশিন পরিচালনায় পাকা জ্ঞান ভিন্ন ঠিকভাবে তা চালানো সম্ভব নয়, তখন মানুষ যার সৃষ্টি কার্য অগণিত কৌশলে পরিপূর্ণ এবং যার জীবনের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র বহু বৈচিত্রময় কাজে জড়িত সেই সহস্র প্রকার জটিল মানব মেশিন পরিচালনার কঠিনতম কাজ কি করে ঐ সকল লোক কর্তৃক সম্ভব হতে পারে, যারা নিজেকেও যথার্থরূপে জানতে ও চিনতে অক্ষম? এ সকল অজ্ঞ ও আনাড়ী ব্যক্তি যখন আইন প্রণয়নের অধিকারী হয়ে মানব জীবনের ড্রাইভারি করার দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করে, তখন তার অবস্থা অজ্ঞ মোটর ড্রাইভারের মোটর পরিচালনার ন্যায় দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক হতে বাধ্য। এজন্য যেখানে আল্লাহ ভিন্ন মানুষের রচিত আইন-কানুন স্বীকার করা হয়, এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে মানুষের হুকুম প্রতিপালন করা হয়, সেখানে শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং মানুষই মানুষের অশান্তির সুনিশ্চিত কারণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ফলত মানুষের অত্যাচার অবিচারে মানুষ নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত থাকে, আর আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শক্তি যা মানুষের উন্নতির জন্য ব্যয় হওয়া উচিত, তা মানব জাতির ধ্বংসের জন্য ব্যয় হতে থাকে, আর কার্যত হচ্ছেও তাই। এমনিভাবে মানুষের অন্যায় কার্যের ফলে দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হতে চলছে। কেননা, মানুষ তার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা হেতু অবুঝ বালকের ন্যায় এমন এক মেশিন চালনায় সচেষ্ট, যার সমস্ত কল-কবজা বা অংশবিশেষের যোগ্য পরিচালনায় সে কখনো অভিজ্ঞ নয়। অবশ্য মেশিন পরিচালনায় সবকিছু পুরাদস্তুর খবর রাখেন, এমন যোগ্য চালকের হাতে মেশিন পরিচালনার বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ অর্পণ করাই সবদিক দিয়ে ভালো। কারণ তখন যথাযোগ্য পরিচালনার ফলে উক্ত মেশিন হতে প্রতিনিয়ত মানুষের হিতার্থে বহু মূল্যবান ও উপকারী জিনিস বের হয়ে আসবে। অন্যথায় অযোগ্য পরিচালনার কুফল মানব জাতিকে চিরদিন ভুগতে হবে।

অবিচার কেন

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অজ্ঞতা ভিন্ন মানবজীবনের অকৃতকার্যতার অন্য একটি কারণও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে। সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, মানুষ কোনো এক ব্যক্তি বা গোত্র বিশেষের নাম নয়, বরং মানুষ শব্দে এ দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতিকেই বুঝায়। কিন্তু অনুরূপভাবে সুখ-শান্তি ও সম্মানের সাথে বসবাস করার দিক দিয়েও সকলের সমান অধিকার রয়েছে। মানবীয় সুখ-শান্তি অর্থে একজনের সুখ-শান্তি নয় গোটা মানব জাতির সুখ-শান্তিকেই বুঝতে হবে। তদ্রুপ কোনো এক ব্যক্তি বা গোত্র বিশেষের মুক্তিকেও সত্যিকার মুক্তি বলা চলে না, বরং গোটা সমাজের মুক্তিকেই মুক্তি নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখিত কথাকে জেনে ও মেনে নেয়ার পর একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, গোটা মানব সমাজের মুক্তি ও উন্নতি কি করে সাধিত হতে পারে। আমার মতে এর একমাত্র পন্থা এই যে, মানুষের জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য আইন-বিধান রচনার ভার তাঁরই উপর অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান। সকলের অধিকার তিনিই সুবিচারের সাথে নির্ণয় করবেন তিনি স্বীয় স্বার্থ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবেন এবং তাঁর সাথে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ জড়িত থাকবে না। সমস্ত লোক তাঁরই আদেশ পালন করবে যিনি আদেশ প্রদানে অজ্ঞতাবশত কোনো প্রকার ভুল করবেন না এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে স্বাধীনতার অপব্যয়ও করবেন না। কাউকেও বন্ধু মনে করে তার পক্ষাবলম্বন করা এবং কাউকে দুশমন ভেবে তার বিপক্ষে দাঁড়ানোর বদ অভ্যাস হতেও তিনি সর্বদা মুক্ত থাকবেন। শুধু উল্লেখিত অবস্থাতেই নির্ভুল সুবিচার লাভ করার আশা করা যায় এবং মানব সমাজের সমস্ত ন্যায্য দাবি দাওয়া পূরণ হতে পারে। যুলুম বা অত্যাচার নির্মূল করার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ আছেন কি যিনি সকল স্বার্থপরতা ও উল্লেখিত মানবীয় দুর্বলতাসমূহের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে সক্ষম? খুব সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তরে আপনারা 'না' ভিন্ন 'হাঁ' বলতে সাহসী হবেন না। কেননা বাস্তবিক পক্ষে এটা কেবল আল্লাহ তা'আলারই মহিমা, তাঁরই ক্ষমতা ও গুণ মাত্র। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ উক্ত গুণাবলীর যথার্থ অধিকারী হতে পারে না। এজন্য যেখানেই মানুষের রচিত আইন-কানুন স্বীকার করা হয়, আল্লাহ ভিন্ন মানুষের প্রাধান্য বিস্তার করা হয়, সেখানেই অত্যাচার ও অবিচার বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। সেই সকল শাহী খান্দানী লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,

যারা জোরপূর্বক নিজেদের হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা রেখে দিয়েছে। তারা নিজেদের জন্য সম্মান, অতিরিক্ত দাবি, টাকা আদায়ের উপায় ও এমন সব ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা অন্যান্যদের জন্য রাখা হয়নি। তারা অবস্থান করছে আইনের গণ্ডীর বাইরে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। তারা যা ইচ্ছা তাই করে, কোনো আদালত তাদের বিরুদ্ধে 'সমন' পর্যন্ত জারি করতে সাহস পায় না। তাদের এই সকল অন্যায় আচরণ দেখে-শুনে লোকেরা শুধু এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবকিছু বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় যে, বাদশাহগণ সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। অথচ দুনিয়ার প্রত্যেক লোকই একথা জানে যে, এরা সাধারণের মতই মানুষ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও শক্তির প্রভাবে এরা খোদা সেজে উচ্চাসনে সমাসীন আর অন্যান্য দুর্বল জনসাধারণ তাদের সম্মুখে করজোড় ও কম্পিতভাবে দন্ডায়মান হয়, যেন তাদের জীবন-মরণ এবং জীবিকা ও সম্পদ তাদের হাতেই সীমাবদ্ধ। প্রজাদের শ্রমোপার্জিত টাকা-পয়সা অন্যায়ভাবে আদায় করা হয়। উক্ত টাকা-পয়সা রাজোচিত প্রাসাদ নির্মাণে ও বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুতকরণে নির্বিবাদে ব্যয় হতে থাকে। এমন কি তাদের একটি কুকুরের জন্য এমন সব খাদ্য দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা হয়, যা প্রজাবর্গের পাঁচজন পরিশ্রমী ব্যক্তির ভাগে অনেক সময় জোটে না। এখন চিন্তা করে দেখুন তো, এটা কি বিচার? এসব নিষ্ঠুর নিয়মাবলী কখনো এমন ন্যায় বিচারক প্রভু কর্তৃক সমর্থিত হতে পারে কি, যাঁর সামনে সমস্ত মানব জাতির দাবি-দাওয়া সমান? সেইসব ব্রাহ্মণ, পীর, নবাব, সরদার, জমিদার-জায়গীরদার এবং মহাজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যারা স্বভাবতই নিজেদেরকে জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলে ধারণা করে থাকে, তাদের শক্তির প্রাবল্যে দুনিয়ায় এমন বহু আইন প্রণীত হচ্ছে যা দ্বারা তারাই জনসাধারণ অপেক্ষা ঢের বেশি উপকার লাভ করে থাকে। তাদের ধারণা, তারাই নিস্পাপ আর অন্য সকলে দোষী ও পাপী, তারা ভদ্র আর বাকি সব অভদ্র, তারা শাসক সমস্ত মানুষ শাসিত। তাই আমরা বলতে বাধ্য হবো যে, এ সকল নিষ্ঠুর নীতি ও অন্যায় আচরণ কখনও কোনো সত্যিকার ন্যায় বিচারক কর্তৃক রচিত হতে পারে না। জাতির ঐ সকল নেতা বা পরিচালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যারা শক্তির প্রাবল্যে অন্য জাতিসমূহকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তাদের এমন কোনো আইন বা শাসন পদ্ধতি নেই, যা স্বার্থপরতার ছোঁয়াচ হতে মুক্ত। তাদের ধারণা দুর্বলেরা মানুষ নয়, অথবা অতীব নিম্নশ্রেণীর লোক মাত্র। তারা প্রত্যেক দিক দিয়েই নিজেদেরকে অন্যের তুলনায় বড় করে দেখে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যের স্বার্থ বলি দেয়াকে ন্যায্য মনে করে থাকে। তাই তাদের রচিত প্রত্যেক আইন-কানুনের পেছনে বদনামী ও দুর্নাম লেগে আছে। শুধু ইশারা স্বরূপই উল্লেখিত উদাহরণ কয়টি এখানে বর্ণনা করা হলো। বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এটা নয়। আমি শুধু এ সত্যটি আপনাদের মনে জাগিয়ে দিতে চাই যে, যেখানে মানুষ আইন রচনা করে এবং মানব রচিত আইন কার্যকর রয়েছে, সেখানে অন্যায় ও অত্যাচার ভিন্নরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাই কেউ আপন ন্যায্য দাবি অপেক্ষা অধিক সুযোগ পেয়ে বসেছে, আর কারো যথার্থ স্বার্থ সম্পূর্ণ অন্যায় অমানুষিকভাবে দলিত মথিত হয়েছে। এর কারন এই যে, মানুষের অন্তরে ও মস্তিষ্কে স্বভাবতই স্বজাতি ও স্বগোত্রের উপকার-উন্নতির চিন্তা অন্য জাতির উপকার অপেক্ষা বেশিভাবে জেগে থাকে, তাই অন্যের স্বার্থ বা দাবির প্রতি তারা অপেক্ষাকৃত কম সহানুভূতি সম্পন্ন হয়। এ অন্যায় অত্যাচারের যথার্থ প্রতিকারের পন্থা এই যে, মানুষের রচিত আইন-কানুন ও শাসন-পদ্ধতি ত্যাগ করত আমরা একমাত্র আল্লাহ প্রণীত আইন-কানুন ও আদেশ-নিষেধাবলী মেনে চলবো। একমাত্র তাঁরই দৃষ্টিতে সমগ্র মানব জাতি সমান মর্যাদাসম্পন্ন। ব্যবধান শুধু মানুষের কর্মতৎপরতা, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতার ভিতর দিয়েই পরিলক্ষিত হবে, বংশ শ্রেণী বা জাতিগত কোনো প্রকার আভিজাত্য সেখানে কারো জন্য স্বীকৃত হয় না এবং হতেও পারে না।

শান্তি কিভাবে স্থাপিত হতে পারে

আপনারা আবশ্য জানেন যে, মানুষকে আয়ত্তাধীন রাখার প্রধানতম উপায় হচ্ছে দায়িত্বানুভূতি। তাই যদি কারো এরূপ ধারণা হয় যে, তাকে তার কোনো কাজের জন্য কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না, বরং সে তার কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন ; এমনকি, তার নিকট কোনো অন্যায় কাজের কৈফিয়ত তলব করার এতোটুকু অধিকার পর্যন্ত কারো নেই, তখন উক্ত মানুষের অবস্থা হবে লাগামহীন উটের সমতূল্য। একথাটি কোনো এক ব্যক্তি বিশেষের বেলায় যেমন প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে কোনো দল, সমাজ বা সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎ কোনো একদল লোক যখন ভাবে যে, তারা তাদের কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এমন কি তাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ দুটি কথাও বলার অধিকার কারো নেই, তখন উক্ত দল কর্তৃক 'ধরাকে শরা জ্ঞান করা' মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। এমনিভাবে যখন কোনো এক জাতি অন্য জাতির উপর এবং কোনো এক রাজা আপন রাজত্বের সীমায় নিজেকে সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন মনে করার সুযোগ পায়, তখন উক্ত প্রবল জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতি ও রাজা কর্তৃক নিরীহ প্রজাবর্গ নানাদিক দিয়েই নিপীড়িত ও নির্যাতিত হতে থাকে। এ নিষ্ঠুর সত্যটি এ দুনিয়ার সমস্ত অশান্তির প্রধানতম কারণ স্বরূপ বিভিন্ন রঙ্গে ও রূপে

অহরহ আমাদের চোখের সামনে প্রকাশ হতে চলেছে এবং যতোদিন পর্যন্ত মানুষ তদপেক্ষা কোনো এক বিরাট শক্তির নিকট আপন কাজের জন্য দায়ি হওয়ার সত্যটি মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, ততোদিন পর্যন্ত অত্যাচারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতে পারে না।

এখন আপনারা আমাকে বলুন, উক্ত বিরাট শক্তির প্রকৃত মালিক এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারে কি? মানুষের মধ্য হতে তো কেউ এ শক্তির অধিকারী হতে পারে না। কারণ এ শক্তির অধিকার লাভের পর মানুষ হবে অত্যাচারী ও অবিচারী। এক কথায় সে তখন হবে এ দুনিয়ার ফেরাউনদের অন্যতম। ফলে কেউ হয়ত তার সমর্থন লাভ করে খুব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার সুযোগ পেয়ে বসবে, আর কেউ বা তার রোষাগ্নিতে পতিত হয়ে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হবে। তাই এ জটিল সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ইউরোপে ষবধমঁব ড়ভ হধঃরড়হ বা জাতিসংঘ কায়েম করা হয়েছিল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের সেই সংঘের অস্তিত্ব তেমন মজবুত হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত সেই তথাকথিত জাতিসংঘ মুষ্টিমেয় কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতের ক্রীড়নক সেজে ছোট ও দুর্বল রাজ্যসমূহের সাথে অবিচার করে শান্তির পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখিত তিক্ত অভিজ্ঞতার পর একথা আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এমন কোনো শক্তির সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয় যা দ্বারা এ দুনিয়ার বড়-ছোট সমস্ত জাতির শক্তিকে যথাযথভাবে আয়ত্তে রাখা যায়। তাই আমরা বলতে বাধ্য হবো যে, উক্ত শক্তি নিশ্চিতরূপে মানবীয় সীমার বহু উর্ধে তদপেক্ষাও ঢের উচ্চ শ্রেণীর জিনিস, আর তা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও মহিমা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাই এ দুনিয়ায় সুখ-শান্তিতে বসবাস করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করত বিশেষ বিনীত ও অনুগত প্রজাসম তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা ও দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন পোষণ করা আবশ্যক যে, তিনি আমাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু অবগত আছেন এবং একদিন আমাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব আমলনামা হাতে নিয়ে তাঁর আদালতে হাজির হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

বস্তুত একমাত্র উল্লেখিত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের মধ্যেই মানব জাতির সত্যিকার সুখ-শান্তি নিহিত।

একটি সন্দেহ

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আপনাদের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে আরো একটি জরুরি কথা নিবেদন করা আবশ্যক মনে করছি। আপনারা স্বভাবতই ভাবতে পারেন যে, যখন আল্লাহর আদেশ ভিন্ন ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো শক্তিই এদিক-ওদিক চলবার সামর্থ নেই বলে প্রমাণ পাওয়া গেলো, যখন সমগ্র মানবসমাজ আইনগত আল্লাহর রায়ত শ্রেণীতে পরিনত হলো, তখন ক্ষুদ্র মানব কি করে আল্লাহদ্রোহী হতে সাহসী হয়? কি করে বান্দাদের উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তার করত অন্যায় ও অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে থাকে? কেন আল্লাহ তাআলা যথাসত্ত্বর উক্ত অত্যাচারীর শাস্তি বিধান করেন না?

এ সন্দেহের উত্তর এই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরাট রাজত্বের সামনে কয়েকটি মানুষ এ দুনিয়ার শক্তিশালী কোনো এক বাদশাহ কর্তৃক তাঁর অধীনস্ত কোনো স্থানের শাসনকার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী স্বরূপ। উক্তস্থানের অন্তর্গত রেল লাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, দেশ রক্ষা ও সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি তাঁরই করতলগত। তাই তাঁর ব্যাপক শক্তির তুলনায় তৎকর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর ক্ষমতা অতীব তুচ্ছ ও নগণ্য। এমনকি, বাদশাহের ইচ্ছা ভিন্ন কর্মচারীর এক পা এদিক-ওদিক চলার শক্তিও নেই, কিন্তু বাদশাহ উক্ত কর্মচারীকে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সৎ-অসৎ ব্যবহারের পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করত দূর হতে নীরবে তার কার্য নিরীক্ষণ করে থাকেন। এমতাবস্থায় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ভদ্র ও নিমক হালাল (কৃতজ্ঞ) কর্মচারী রাজপ্রদত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়েও দেশের কোনো প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের সৃষ্টি না করে রাজভক্ত কর্মচারীর ন্যায় আপন কতর্বø সম্পন্ন করে নিজেকে রায়ত বা প্রজার নিকট প্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়। ফলে বাদশাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন, পক্ষান্তরে কর্মচারী যদি দুষ্টবুদ্ধি ও নিমকহারাম (অকৃতজ্ঞ) হয় এবং প্রজাগণ যদি নির্বোধ বা অশিক্ষিত হয় তখন উক্ত কর্মচারী বাদশাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় নিজেকে পূর্ণ ক্ষমতাবান মনে করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করার অন্যায় সাহসেও সাহসী হয়ে থাকে। আর এদিকে মূর্খ ও অশিক্ষিত প্রজাবর্গ কোর্ট আদালতে চাকুরির কাজে এমনকি ফাঁসির আদেশ প্রদানেও উক্ত কর্মচারীর পূর্ণ ক্ষমতা দর্শন করে তাকে বাদশাহ বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর ঐদিকে বাদশাহ দূর হতে অন্ধ প্রজাবর্গ ও বিদ্রোহী কর্মচারীর অন্যায় আচরণ নিরীক্ষণ করতে থাকেন। ইচ্ছা করলে মুহূর্তেই তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতে পারেন, কিন্তু তিনি খুব ধীর-স্থির, তাই সত্ত্বর শাস্তির ব্যবস্থা না করে প্রজাবর্গ ও কর্মচারীকে স্বাধীনতা প্রদান করেন তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন

যেনো তাদের দুষ্টবুদ্ধির সকল মাত্রা পুর্ণভাবে প্রকাশ পায়। বাদশাহ অচিরেই এদের জন্য কোনো শাস্তি বিধান করেন না। এর কারণ এই যে, তার শক্তি এতো বিরাট ও ব্যাপক যে, উক্ত বিদ্রোহী কর্মচারী হাজার চেষ্টা করেও তাঁর বাদশাহী ছিনিয়ে নিতে কখনো সক্ষম নয় বরং বিদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞতার দ্বারা স্বীয় ধ্বংসের সুনিশ্চিত কারণ হতে থাকবে। এরূপে প্রজাবর্গের বিদ্রোহ ও অন্যায় আচরণ যখন চরমে উঠে, তখন বাদশাহের পক্ষ হতে উভয়ের জন্য এমন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, যার হাত হতে অব্যাহতির কোনো তদবীরই তখন আর কার্যকরী হয় না।

বন্ধুগণ!

আমরা উক্ত রাজ-কর্মচারী এবং প্রজাবর্গের প্রত্যেক ব্যক্তি আজ উল্লেখিত কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত। এখানে আমাদের জ্ঞান, শক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা ও আনুগত্যের কঠিন পরীক্ষা চলছে। আমাদের প্রত্যেককে আজ এ মীমাংসা করতে হবে যে, আমরা আমাদের প্রকৃত বাদশাহের নিমক-হালাল প্রজা কিনা। অবশ্য আমি আমার জন্য নিমক হালাল হওয়ারই চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হয়েছি এবং প্রত্যেক আল্লাহদ্রোহীর সাথে পরিষ্কাররূপে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। আর আপনারাও আপনাদের স্ব-স্ব পথ নির্ধারণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। একদিকে ঐ সকল উপকার ও অপকার, যা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিবান আল্লাহদ্রোহী কর্মচারীর মধ্যস্থতায় আপনারা পেয়ে থাকেন, অন্যদিকে ঐ সকল লাভ-লোকসান, যা স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাহদের উপর পৌছাতে ষোলআনা সক্ষম। এখন আপনারা আপনাদের পছন্দনুযায়ী এ দুয়ের কোনো একটিকে নিজেদের জন্যে মনোনীত করুন।